



সাহিত্য বাতায়ন

তরুণ
উদীয়মান
কলম

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনলাইন পত্রিকা

অনলাইন সংস্করণ | ১৬ অক্টোবর ২০২৬ খ্রি. | ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ | বার: শুক্রবার

✉ editor.sahityabatayan@hotmail.com f facebook.com/share/1JSyDFrYBK 🌐 digital-bd.github.io/sahiya-batayan

বিষাদ

ফারুক আহমেদ জীবন



নভোমণ্ডল ছায়াতে মানব কায়াতে
মায়াতে জড়ায়
যতোটুকু না খুশির রৌদ্রর ঝিলিক ছড়ায়
গগন দেখায় সেতো বহুদূর...
একবার হৃদয় হলে ব্যথাতুর,
কি- যে, দুঃখের মাদল তোলে হঠাৎই
ব্যথিত বেদনার সুর।
অন্তর জুড়ে বিধুর সুরে কি- যে করে...
পলক পড়তে যতোটুকু দেরি
মন গগনে কালো মেঘ জমে ভারী
সেইনা ক্ষনে ভীষণ যন্ত্রণার মাদল বাজায়
বিষাদ ঝঞ্ঝা হাওয়ায়
আঁখি কোণে বাদল ঝরে ঠিক,
এতোটুকুও করে না তো কালক্ষেপণ
বিষাদ দেখে না সময়

মানে নাতো কোনো সে দিন তারিখ।

কয়জনেই- বা হয়

সে ব্যথার সম ব্যথিত জনা?

ব্যথিত বিনে ব্যথিতের ব্যথা কি আর

বোঝে কভু অন্যজনা?

এ ভবে যা-কিছু বেচাকেনা হয় সমানে সমান

সুখ হয়তো- দুঃখের বাজারে যায় বেচা

দুঃখের বাজারে কি আর

সুখটাকে কখনো কি যায় কেনা?

যেমন তামা বিক্রি হয় ঠিক তামার দামে

সোনার দামে বিক্রি হয় সোনা।

তুমি আমার কবিতা

মুহিতুল ইসলাম মুন্না



যাপিত জীবনে ঝঞ্ঝারিত যত রোমান্টিক
শব্দ কবিতা হয় সব তোমার জন্য লেখা
কিন্তু কখনো কবিতায় তোমাকে লিখি না।

নীল বিষাদের শরৎ

জান্নাত আক্তার শিলা



হে শরৎ, আকাশ তোমার কেন এত পরিষ্কার?
মন যে আমার মুক্ত নেই কোনো অন্ধকার।
তবে কেন এই আকাশ এত বেশি নীল?
তোমরাই দায়ী মানুষ এর পেছনে মিল।
আমরা দায়ী? এ কেমন অদ্ভুত কথা!
মানুষের মনে কেন এত কষ্ট এত ব্যথা?
আমাদের বেদনার সাথে তোমার কী সংযোগ?
বিষাদের চিরন্তন বণি তো নীলযোগ।
তবে কি আমাদেরই যাতনা ধারণ করো বুক?
অবুঝ তোমরা, মেতে আছো বৃথা দুঃখে।
শরৎ থামলো, রেখে মনে এক অনন্ত প্রশ্ন—
মানুষের বুক কেন এত বিষাদের বসন্ত?
আমি শুদ্ধ, একা একা ভাবি বসে তাই—
সত্যি তো মানব বেদনার কোনো শেষ নাই!
(শিক্ষার্থী, ইডেন মহিলা কলেজ)

আপনার লেখা পাঠান — ওয়েবসাইটের “লিখুন” ফর্মে অথবা ইমেইলে:

editor.sahityabatayan@hotmail.com



অনলাইন সংস্করণ | ১৬ অক্টোবর ২০২৬ খ্রি. | ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ | বার: শুক্রবার

✉ editor.sahityabatayan@hotmail.com f facebook.com/share/1JSydFrYBK 🌐 digital-bd.github.io/sahiya-batayan

ছিন্ন বীণা

আয়মান মাহী



বীণাখানি তব পড়িয়া দেখে অযতনে এক
কোণে,

লয় না কেহ তুলিয়া তারে প্রেমময় সিক্ত মননে।

ছিন্ন তাহার তারগুলি, জীর্ণ হইয়াছে সবটাই,

ধূলাবালির পরোতে পরোতে সুর আজি কোথা
পাই?

ঘরখানি দেখে বন্ধ নীরব, আলোরা নিয়াছে
বিদায়,

তাহার মাঝে পড়িয়া তব বীণাখানির নাহি সহায়।

সুপ্ত সে সুরধারা আজিকে, কাঁদিছে হৃদয় গহীনে,

বিষণ্ন যাতনা ছাইয়াছে তারে, স্মৃতির ঘুরিছে
স্বপনে।

হারাইয়াছে আজি সে রণন তাহার—মধুর রাগিণী
ভরা,

গুঞ্জরিত সুরভি-মাঝে কেবলই নীরব বিরহ-ধারা।

যামিনী আসিছে রূপোলি আভায়—ভরিবে কি
আর সে বাদ্য?

বহিবে পুনঃ সেই সুরলহরী, সেই প্রেমময় গীতের
ছন্দ?

স্বর্ণালী রবির কর-স্পর্শে কি সঞ্চরণ হইবে সে
সুর,

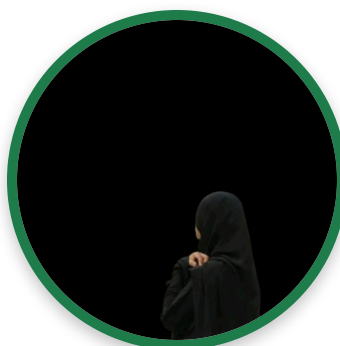
নাকি ধুলোয় লুটায়িত রহিবে সে—তব থাকিবে
এমনই বিধুর!

তুলিবে না কি কেহ ছিন্ন সে বীণা, বাঁধিবে না নতুন
তারে?

বীণাখানি তব জাগিবে কি আর—গাহিবে সুরে
সুরে!

ঋতুর ক্যানভাসে শরৎ

শাহতাজ জাহান সাদিয়া



ওহে দেখেছো কি তোমরা,

শরৎ যে কড়া নাড়ে দোর গড়ায়।

শিউলি হাসে শিশির মাখা ঘাসে,

সোনা রোদ আলতো করে পাতার ফাঁকে হাঁসে।

কাশফুল দোলে হাওয়ার তালে, নদীর বুকে ঢেউ,

নীল আকাশে মেঘের ভেলায় হারায় মনের কেউ।

প্রজাপতির ডানায় ভর করে রোদের মিষ্টি হাসি,

শরৎ মানেই স্নিগ্ধতায় প্রকৃতির ভালোবাসি।

শিক্ষিত মানুষ

আফরিদা ইসলাম



সার্টিফিকেট ভুরি ভুরি,

তবু মনুষ্যত্ব নেই তারই।

পথে চলে দান্তিকতার ভারে,

এদিক-ওদিক তাকায় না সে রে।

উঁচু-নিচু বিভেদ ভালো জানে,

মানুষকে সে গুণতে নাহি পারে

টাকা-পয়সার হিসেব ভালো রাখে

সে নাহি চলে বিবেকের কথা মেনে।

চাকর-বাকর সে তো নোংরা মানুষ,

নিজে তো ভারি শিক্ষিত মানুষ।

তার আছে বিরাট মান,

রয়েছে তার অনেক গুনগান

অপমান করতে তার মুখে নাহি বাঁধে,

‘শিক্ষিত’ শব্দটি তো তাকে নাহি সাজে।

অহংকারী কণ্ঠে সে বলে উঠে ছুটে চল—

তোরা সব মুখের দল!

আপনার লেখা পাঠান — ওয়েবসাইটের “**লিখুন**” ফর্মে অথবা ইমেইলে:

editor.sahityabatayan@hotmail.com



সাহিত্য বাতায়ন

তরুণ
উদীয়মান
কলম

অনলাইন সংস্করণ | ১৬ অক্টোবর ২০২৬ খ্রি. | ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ | বার: শুক্রবার

✉ editor.sahityabatayan@hotmail.com f facebook.com/share/1JSydFrYBK 🌐 digital-bd.github.io/sahiya-batayan

দশভূজা

দিলীপ কুমার পাত্র



একশো আটটি নাম যে তোমার

দশভূজা মাগো

অসুর নিধন করার সময়

কেমন করে জাগো?

মর্ত্যে এলে খুশির হাওয়া

নীল গগনও হাসে

সাদা পেখম থাকে পরে

দেখি কত কাশে!

শিউলি ফুলও সুবাস ছড়ায়

ধনী গরিব কাজে

ঢাকের তালে কোমর দোলে

সকাল কিংবা সাঁঝে।

আধার ঘুচাও আলো দিয়ে

মর্ত্যবাসী সুখে

তোমার পরশ পেলে মাথায়

সাহস আসে বুকে।

অন্তর্যামী মাগো তুমি

সবার পাশে থেকে

ভক্তদের ওই সदा সময়

আগলে তুমি রেখো।

বিজয়ার সুর বাজলে পরে

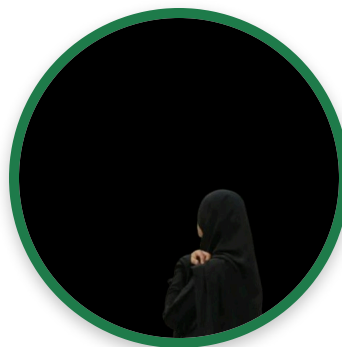
বারি নয়ন মাঝে

একটা বছর পরে মাগো

এসো নতুন সাজে।

পাখির ছানা

ফাতেমা আক্তার



যদি হতাম পাখির ছানা

উরতাম আকাশে মেলে ডানা

থাকতো নাতো কোন মানা

মুক্ত হতো হৃদয় খানা

আমার বাকি অনেক যানা

দেখবো এই জগৎ খানা

শুধু একটু পেলে সুযোগ

রাখবো স্মৃতির পাতায়

মেলে দু চোখ।

শিক্ষার্থী, ইডেন মহিলা কলেজ

ঋতুর ক্যানভাসে শরৎ

শাহতাজ জাহান সাদিয়া



ওহে দেখেছে কি তোমরা,

শরৎ যে কড়া নাড়ে দোর গড়ায়।

শিউলি হাসে শিশির মাখা ঘাসে,

সোনা রোদ আলতো করে পাতার ফাঁকে হাঁসে।

কাশফুল দোলে হাওয়ার তালে, নদীর বুকে ঢেউ,

নীল আকাশে মেঘের ভেলায় হারায় মনের কেউ।

প্রজাপতির ডানায় ভর করে রোদের মিষ্টি হাসি,

শরৎ মানেই স্নিগ্ধতায় প্রকৃতির ভালোবাসি।

শিক্ষার্থী, ইডেন মহিলা কলেজ

আপনার লেখা পাঠান — ওয়েবসাইটের “**লিখুন**” ফর্মে অথবা ইমেইলে:

editor.sahityabatayan@hotmail.com



অনলাইন সংস্করণ | ১৬ অক্টোবর ২০২৬ খ্রি. | ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ | বার: শুক্রবার

✉ editor.sahityabatayan@hotmail.com f facebook.com/share/1JSydFrYBK 🌐 digital-bd.github.io/sahiya-batayan

কাব্যে কলম কালি

সাজ্জাদ হাসান



কলমে ইচ্ছে জাগে
থাকবো বুক পকেটে,
দোয়াত কালি লিখনে সহজ সরল পথে।
কলম কালি দোস্তি
লড়াই যত মুষ্টি,
কাব্যে কলম কালি প্রাণেতে স্বস্তি।

গর্ভে মায়ের ধারণ
কলম কালি জনম,
আপন দেশে খেয়ায় ডেউয়ে তালি কসম।
সুর ধরে বর্ণমালা
দোয়েল পাখির শিসে,
বাংলা মাটির গান রক্তে থাকবো মিশে।

বাংলা মায়ের অ আ
বাংলা ভাষার গর্ব,
হাতে কলমে শিখবো জানা অজানায় খর্ব।
বড়াই কলম কালি
জগতে কথা তুলবো,
যা কিছু চোখে সামনে ভোরে দুয়ার খুলবো।

কলমে যত শিক্ষা কালির তত দীক্ষা,
জ্ঞানে গুণে জাতির পরীক্ষা নীরিক্ষা।

মানবাত্মার দীক্ষা

বৈশাখী খাতুন



স্নিগ্ধ কুয়াশায় কিসের অন্বেষণ,

যেথায় রবে নীরব সাধন।

চেয়ে দেখ সূদুর পানে,

মিলবে কি সেথা নন্দনচালে।

কী হেতু খোঁজ অতল সাগরে,

সৌন্দর্য রবে আপন নীড়ে।

শোধিত কি তব অন্তরদিশা,

নইতো অবগত মানবনিশা।

দুশিবে সদা পরজনে,

ভ্রান্ত প্রত্যয় নিজ মনে।

দূর কর সর্ব অহমিকা,

পাবে খুঁজে প্রশান্তিহায়া।

চিলেকোঠার

সোপায়

সজিত কুমার



শরৎপল্লীর কুয়াশার চাদরে
সীমাহীন প্রসন্নতার বিদর্ভ মহানগরী।
সাদা নীলের সমাহার গগনে
দিবাকর তির্যক আলোকরশ্মি।
পথচারীর গন্তব্যে এক বিশ্বস্ত প্রতিশ্রুতি।

স্বর্গসিঁড়ি যাত্রা নৈপথে
দুটি বাহুর প্রশান্তির মলিনতার স্পর্শ ছোঁয়া।
হাজার বছর ধরে
তোমারে দেখার আকুতি অনন্ত অভিসার।

হঠাৎ অদেখায় দেখা
তোমার নারীত্বের ছায়া,
ঢের বুঝিয়াছিলাম
স্নিগ্ধ নয়নে নিস্তন্ধ মায়া।
সীমান্ত পাহাড়ি ঝর্ণাধারায়
সাগরিকার মোহনায়,
আর্শনগরের নিঃসঙ্গ প্রকৃতিতে
তুমি আজও চেতনায়।

খড়কুটো এক বাঁশের কেলা,
প্রণয়ের হস্ততা বুনন উপকথার স্বর্গরাজ্য
তবুও শিকড় আঁকড়ে ধরে
বাঁচতে চাই তাজমহলের প্রতিটি ইট
ধূলিকণার স্মৃতিস্তম্ভে।

আপনার লেখা পাঠান — ওয়েবসাইটের “লিখুন” ফর্মে অথবা ইমেইলে:

editor.sahityabatayan@hotmail.com



অনলাইন সংস্করণ | ১৬ অক্টোবর ২০২৬ খ্রি. | ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ | বার: শুক্রবার

✉ editor.sahityabatayan@hotmail.com f facebook.com/share/1JSyDFrYBK 🌐 digital-bd.github.io/sahiya-batayan

হলুদ খামের দিনগুলি

জনি সিদ্দিক



২০০৮ থেকে ২০১২ সালের দিকের কথা। তখন মোবাইল ফোনের এত প্রচলন ছিল না। হাতে হাতে ফোন, মুহূর্তেই খবর আদান-প্রদান কিংবা অনলাইনে কিছু অর্ডার করার সুযোগও সবার ছিল না। কুরিয়ার সার্ভিস চালু থাকলেও তা এখনকার মতো এতটা সহজলভ্য ছিল না। শুধুমাত্র মফস্বল শহরগুলোতে কুরিয়ার সার্ভিস ছিল। তাই চিঠিপত্র পাঠানো কিংবা ছোটখাটো জিনিস আনা-নেওয়ার জন্য পোস্ট অফিসের ওপরই বেশি ভরসা করতে হতো।

তখন লেখালেখি সবে শুরু করেছি। তাই বেশ মনোযোগ দিয়ে লেখালেখি করতাম। কাগজ-কলমে লিখে পাঠাতাম। তারপর লেখাগুলো ফটোকপি করে রাখতাম স্মৃতি হিসেবে। শুধু পরিচিতজনদের নয়, চিঠির মাধ্যমে নতুন নতুন বন্ধুও তৈরি হতো। পত্রমিতালি করতাম। ম্যাগাজিনগুলো থেকে ঠিকানা নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকা লেখকদের সঙ্গে চিঠি আদান-প্রদান হতো। একজনের চিঠির উত্তর দিতে দিতে কখন যে পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে যেত, তা বোঝাই যেত না। এখনকার মতো তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছিল না, তাই চিঠিই ছিল পরিচিত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। বাটন ফোন ছিল কিছু মানুষের সঙ্গী হিসেবে, তাও সীমিত পরিসরে।

লেখালেখির সুবাদে বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো পত্রিকার সৌজন্য কপি অথবা চিঠি আসত। ডাকপিয়নের কাছ থেকে পত্রিকা বা চিঠি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতাম। প্রতিদিনই কিছু না কিছু আসবে এমন একটা আগ্রহ সব সময় কাজ করত।

আমি যে মাদ্রাসায় পড়তাম, তার একেবারে পাশেই ছিল পোস্ট অফিসটি। (উল্লেখ্য যে, আমি একই মাদ্রাসায় ক্লাস সিক্স থেকে ফাজিল বা বি.এ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি।) বাড়ি থেকে পোস্ট অফিসের দূরত্ব তিন কিলোমিটার। সপ্তাহে পাঁচ দিন পোস্ট অফিস খোলা থাকত। তাই পোস্ট অফিসে যাওয়া অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কিছু আসার কথা থাকলে অপেক্ষা করতাম, আর কিছু না থাকলেও খোঁজ নিতাম।

পোস্ট অফিসের ডাকপিয়ন ও পোস্টমাস্টার দুজনই আমাদের পারিবারিকভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে কথা হতো, খোঁজখবর নেওয়া হতো। ফলে পোস্ট অফিসে যাওয়াটা শুধু চিঠি বা পার্সেল নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার বিষয়টিও ছিল। এখন ডাকপিয়ন আর বেঁচে নেই (আল্লাহ তাঁর নেক আমলসমূহ কবুল করুন, গুনাহসমূহ মার্জনা করুন)। পোস্টমাস্টারও অসুস্থ। কথাগুলো মনে হলে খারাপ লাগে। একসময় যাঁদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা হতো, সময়ের ব্যবধানে তাঁদের জীবনেও কত পরিবর্তন এসেছে।

তখনকার দিনের ডাকখরচের কথাও মনে আছে। এক টাকার পোস্টকার্ড, হলুদ খামের দাম প্রথমে দুই টাকা, পরে তিন টাকা হয়েছিল। আর রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠাতে খরচ হতো চার টাকা। ডাকপিয়ন বাড়িতে এসে চিঠি দিয়ে যেতেন। দূরের কেউ চিঠি পাঠালে সেই চিঠি হাতে পাওয়ার আনন্দই ছিল আলাদা। এখনকার মতো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়া যেত না। চিঠি লিখতে

হতো, পাঠাতে হতো, তারপর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হতো। এতে কখনো কখনো মাসখানেক সময় লেগে যেত।

এখন আর গ্রামের বাড়িতে থাকি না। থাকি গাজীপুরে। ইদানীং এখানেও পোস্ট অফিসের মাধ্যমে জিনিসপত্র নিতে হচ্ছে। এ কারণে পুরোনো দিনের কথা আবার মনে পড়ে যায়। তবে আগের সেই পরিবেশ আর নেই। সময়ের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম বদলেছে, মানুষের অভ্যাসও পাল্টে গেছে। পোস্ট অফিসও নতুন নতুন সেবা চালু করেছে। তারপরও এই খাতের নানা সীমাবদ্ধতা ও অবহেলার কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। সরকারি এই সেবাকে আরও উন্নত ও সহজলভ্য করতে হলে এসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠা জরুরি।

পোস্ট অফিসের সঙ্গে আমার বর্তমান সম্পর্কটা তাই শুধু চিঠি বা পার্সেল নেওয়ার নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে লেখালেখির দিনগুলো, পত্র-মিতালির মাধ্যমে বন্ধু তৈরি করা, চিঠি-পত্রিকার জন্য অপেক্ষা করা এবং পরিচিত কয়েকজন মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার স্মৃতি। এখন জীবন অনেক বদলে গেছে। যোগাযোগও আগের চেয়ে অনেক অনেক সহজ হয়েছে। তবু কখনো পুরোনো দিনের কথা মনে পড়লে সেই পোস্ট অফিসের সামনে গিয়ে অপেক্ষা করার দৃশ্যটা চোখে ভাসে। মনে হয়, দিনগুলো সত্যিই অন্য রকম ছিল।

আপনার লেখা পাঠান — ওয়েবসাইটের “লিখুন” ফর্মে অথবা ইমেইলে:

editor.sahityabatayan@hotmail.com



অনলাইন সংস্করণ | ১৬ অক্টোবর ২০২৬ খ্রি. | ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ | বার: শুক্রবার

✉ editor.sahityabatayan@hotmail.com f facebook.com/share/1JSydFrYBK 🌐 digital-bd.github.io/sahiya-batayan

রখীন পার্থ মণ্ডলের দুটি

অণুগল্প

অপরাজিতার জয়

একটা সন্তানের জন্য আজ বারো বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে অপরাজিতা। অবশ্য এর জন্য তাকে কম কথা শুনতে হয়নি। শ্বশুরবাড়ি, পাড়া প্রতিবেশী এমনকি নিজের জন্মদাতা বাবা-মায়ের কাছ থেকেও কথা শুনতে হয়েছে তাকে। অয়ন তাকে ভরসা দিয়ে বলে, সন্তানসুখই কি বড় কথা? ভগবান চাইলে সবকিছুই হবে। জীবনে থেমে থাকেনি অপরাজিতা। নিজস্ব ছন্দে বয়েছে তার জীবন। অফিস ছুটির পর অপরাজিতার প্রতিদিনের অভ্যাস গঙ্গার পাড়ে আসার। সেদিনও সে এসেছিল, পেয়েছিল বাঁচার রসদ। সম্বিৎ ফেরে জয়ের ডাকে, যাকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করে সার্থক ডাক্তার তৈরি করেছে, জবাব দিয়েছে অপমানের।

খুশি নেই খুশি

হাসপাতাল থেকে রফিকের মৃত্যুর খবর আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল রফিকের স্ত্রী সুলতানা ও মেয়ে খুশি। অনেকবার বারণ করা সত্ত্বেও কারখানায় পাথর ভাঙার কাজটা ছাড়তে পারেনি রফিক, মেয়ের মুখের দিকে চেয়েও আর পেটের জ্বালাতেও। রফিকের মৃত্যুর খবর চাউর হতেই বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠলো গোটা কোলিয়াড়ি এলাকা। দেহ রাস্তায় ফেলে রেখে বিক্ষোভ চলতে লাগলো শ্রমিকদের। পরিস্থিতি সামাল দিতে কালঘাম ছোট্টে সবার। শ্রমিকদের সিলিকোসিসে আক্রান্ত হবার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। রফিক তার নবতম সংযোজন। সে জেনে গেল না আর কতজন রফিকের প্রাণ গেলে সিলিকোসিসমুক্ত হীরে উঠে আসবে খাদান থেকে, খুশির আলোয় কবে আলোকিত

হয়ে উঠবে পরিবারগুলো তাও অজানাই থেকে গেল তার কাছে।

লোডশেডিংয়ের যত কাণ্ড

সুকবি চন্দ্রবত্তী

বিদ্যুৎ গেল সন্ধ্যাবেলা, মাথার উপরের পাখা
যখন হয়ে গেল বন্ধ,

ঘামতে ঘামতে দাদুর মুখে জমে গেল হাজার
হাজার দ্বন্দ্ব!

বাবা রাগে বলল, “মোমটা কোথায়?” মা বলল,
“হায় হায়!”

ছোট্ট ছেলে হাসতে হাসতে মোবাইল খুঁজে পায়!

ফ্রিজের ভেতর মাছগুলো সব করছে এক নীরব
কান্না,

মশার দল তো সুযোগ পেয়ে শুরু করেছে
আনন্দের বন্যা!

দাদু বসে হাতপাখা নেড়ে দিলেন এক হাই,

দিদা বলেন, “বাতি এলে ডাকতে ভুলো নাই!”

পড়ার বইটা খুলে বসে ছাত্র দিল যে ঘুম,

শিক্ষক ফোনে জিজ্ঞেস করেন, “পড়া হচ্ছে কেন
কম?”

বিদ্যুৎ এলে সবাই খুশি, পাখা ঘোরে জোরে,

মশার দলও তখন পালায় প্রাণটা হাতে করে!

লোডশেডিং, তুমি যাও গো, আর এসো না ভাই,

তোমার জন্য ঘামতে ঘামতে হাসিও যেন শুকিয়ে
যায়!

৪টি অণু-কবিতা

মুহিতুল ইসলাম মুন্না



১.
সময়ের বাঁধা পিছু ছাড়ে না
কথা হওয়ার পর কথাও অতীত হয়।
সময় মাথার উপর কড়া নাড়ে
হাত থেকে খসে গেলেই অতীত হয় যতো,
ঠিক স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার মতো।

২.
ভুল থেকেই ফুল আসে
তাই মানুষ করে ভুল
হৃদয় থেকে হৃদয় মিলে
তখন তা হয় ফুল।

৩.
তীব্র রৌদ্রে ছায়া হয়ে
বৃষ্টি বাদলে ছাতা হব।
প্রিয় ফুল তোমায় আমি
কাটা হয়ে আগলে নেবো।

৪.
শূন্য পথ চেয়ে আছে মন
হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে সময়
বসুধায় কি করেছে হায়
পাপ ভর্তি কায়া হবে বিদায়।

আপনার লেখা পাঠান — ওয়েবসাইটের “**লিখুন**” ফর্মে অথবা ইমেইলে:

editor.sahityabatayan@hotmail.com



আমি কৃষ্ণিমা

তাহমিদা খানম



আমি কৃষ্ণিমা—নিশীথের নিস্তব্ধতায় নিবিড় হয়ে থাকা সেই আদিম আঁধার, যার বুকে নক্ষত্রেরা তাদের অস্তিত্বের স্বাক্ষর রাখে। আমি গিলাফে আবৃত কাবার কৃষ্ণবর্ণ- অনুভবের গভীরে প্রোথিত এক অনিবার্য উপস্থিতি। আমার অস্তিত্বের অন্তরালে কোনো কৃত্রিমতার প্রলেপ নেই, কোনো আত্মগোপনের অভিসন্ধি নেই; আমার সমস্ত অনিবার্যতা নিয়েই আমি। অথচ এই পৃথিবীতে আমার পরিচয়ই আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রথম অভিযোগ, আমার গাত্রবর্ণই আমার অস্তিত্বের বিপক্ষে দাখিলকৃত আদিমতম সাক্ষ্য। জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই যেন এক অদৃশ্য বিচারালয়ের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি—যেখানে অপরাধের সংজ্ঞা আমার অজানা, অথচ দণ্ডদেশের ভার বহন করে চলেছি প্রতিনিয়ত।

আমি কেশবর্ণের আবরণে কৃষ্ণিমার অনিবার্য উত্তরাধিকার বুকে ধারণ করেই অবগাহন করি সমালোচনার পাথারে। অবজ্ঞার প্রস্তরখণ্ড, বিদ্রূপের বিষাক্ত শলাকা, পরিহাসের তীক্ষ্ণ ফলক—সবকিছুই এসে আঘাত হানে আমার আত্মমর্যাদার প্রাচীরে। কখনো কারও অধনিমীলিত দৃষ্টিতে, কখনো ঠোঁটের কোণে জমে থাকা উপহাসে, কখনো-বা অনায়াসে উচ্চারিত কোনো অবমাননাকর বিশেষণে আমার অস্তিত্বকে সংকুচিত করে আনা হয় একটি মাত্র বর্ণের পরিসরে। যেন আমার সমস্ত সত্তা ও মননকে অস্বীকার করে কেবল ত্বকের রঞ্জক পদার্থটুকুই আমার পরিচয়ের চূড়ান্ত দলিল!

কী বিচিত্র এই সভ্যতার নন্দনতত্ত্ব! যে সমাজ মানুষের আত্মার গভীরতা পরিমাপ করতে অক্ষম, সে-ই তার ত্বকের উপরিতলকে সৌন্দর্যের মানদণ্ডে উন্নীত করেছে। যে দৃষ্টি চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য অনুধাবন করতে পারে না, সে দৃষ্টিই গাত্রবর্ণের তারতম্যে নির্মাণ করেছে শ্রেষ্ঠত্ব ও হীনতার কৃত্রিম বিভাজন। আমার দেহ যেন তাদের নিরন্তর অনুসন্ধানের বিষয়, আমার অবয়ব যেন তাদের নন্দনবোধের পরীক্ষাগার, আর আমার জীবন যেন তাদের আরোপিত ত্রুটির এক অফুরন্ত আকর। আমার নীরবতা তাদের কাছে আত্মসমর্পণ, প্রতিবাদ ঔদ্ধত্য; আমার বিনয় দুর্বলতা, আত্মবিশ্বাস দম্ভ। অর্থাৎ আমার অস্তিত্বের প্রতিটি প্রকাশকেই তারা নিজেদের নির্ধারিত ধারণার অনুকূলে ব্যাখ্যা করে। তারা আমাকে মানুষ হিসেবে না; বরং নিজেদের নির্মিত সৌন্দর্যবোধের সামনে দাঁড় করিয়ে আমার গ্রহণযোগ্যতার বিচার করে।

কিন্তু আমি তো কেবল একটি বর্ণ নই। আমার কৃষ্ণিমার অন্তরালে যে মনন ক্রমাগত পৃথিবীকে পাঠ করে, যে হৃদয় নিঃশব্দে মমতার অনুশীলন করে, যে বিবেক অন্যায়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের অবস্থান নির্ধারণ করে—তার পরিমাপ তোমাদের প্রচলিত নন্দনতত্ত্বের কোনো দাঁড়িপাল্লায় অসম্ভব। আমার অন্তঃকরণে কত অনুচ্চারিত দীর্ঘশ্বাসের স্তর জমে আছে, কত অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা সময়ের নিষ্ঠুর করাঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেছে, কত স্বপ্ন সামাজিক অবজ্ঞার ভারে পল্লবিত হওয়ার আগেই স্রিয়মাণ হয়েছে—তার কোনো হিসাব তোমাদের কাছে নেই। তোমরা আমার ত্বকের দৃশ্যমান বর্ণটুকু পড়তে পারো, কিন্তু আমার অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত পাণ্ডুলিপি পাঠ করার ধৈর্য তোমাদের নেই।

আমি জন্মে কৃষ্ণিমা, রৌদ্রের প্রখরতায় কৃষ্ণিমা, গোধূলির আবছায়াতেও কৃষ্ণিমা; সময়ের অনিবার্য ক্ষয়, ঋতুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তন কিংবা জীবনের বহুবিধ অভিঘাত আমার জন্মগত

পরিচয়কে মোছে না। মৃত্যু যখন আমার পার্থিব অস্তিত্বের সর্বশেষ অধ্যায়ে যবনিকা টানবে, তখনও আমার এই বর্ণ কোনো নৈতিক অপরাধের স্বীকারোক্তি হয়ে উঠবে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমার বর্ণ অপরিবর্তিতই থাকবে। কিন্তু তোমাদের বিচারবোধ এমনই উপরিতলনির্ভর যে, আমার অর্জিত প্রজ্ঞার চেয়ে অনর্জিত গাত্রবর্ণ, আমার চরিত্রের চেয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অবয়ব, আমার মানবিকতার চেয়ে ত্বকের দৃশ্যমান রঞ্জনই তোমাদের কাছে অধিকতর তাৎপর্য বহন করে।

তুমি—শুভ্রতার আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান, বহুবর্ণের প্রসাধনে সজ্জিত, বাহ্যিক ঔজ্জ্বল্যের মোহে আত্মবিস্মৃত এক সত্তা—নিজের প্রতিচ্ছবিকে নানাবিধ অলংকরণে ভূষিত করে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলো। প্রসাধনের প্রলেপে, আভিজাত্যের আবরণে, কৃত্রিম জৌলুশের বহিঃপ্রকাশে তুমি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের এক অলীক উপাখ্যান রচনা করো। অতঃপর আমার কৃষ্ণিমার দিকে তাকিয়ে এমন এক ব্যবধান কল্পনা করো, যার ভিত্তি প্রকৃতিতে নয়, তোমার মানসিকতার গভীরে প্রোথিত কুসংস্কারে।

কিন্তু একবারও কি আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছ? যে শুভ্রতার অহংকারে তুমি অন্যকে অবমূল্যায়ন করো, তার সঙ্গে তোমার অন্তঃকরণের পবিত্রতার সম্পর্ক কোথায়? ত্বকের ঔজ্জ্বল্য কি বিবেকের নির্মলতার নিশ্চয়তা দেয়? বাহ্যিক বর্ণের সৌকর্য কি চরিত্রের মহত্ত্বের অব্যর্থ প্রমাণ? প্রসাধনের বহুবর্ণ আয়োজন কি হৃদয়ের সংকীর্ণতা আড়াল করতে পারে? যদি না পারে, তবে তোমার এই আত্মসন্ত্রস্ততা কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত—প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে, নাকি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটি অনিচ্ছাকৃত শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্মিত আত্মপ্রবঞ্চনার মোহে?

আপনার লেখা পাঠান — ওয়েবসাইটের “লিখুন” ফর্মে অথবা ইমেইলে:

editor.sahityabatayan@hotmail.com



আমি কৃষিমা

দ্বিতীয় প্যারা--

তুমি আমার গাত্রবর্ণে অন্ধকারের প্রতিরূপ খুঁজে পাও, অথচ নিজের চেতনার গভীরে সখিওত বিদ্রোহের কৃষ্ণগহ্বরটি প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম। আমার ত্বকের রং তোমার নন্দনবোধকে আহত করে, অথচ অন্যের আত্মমর্যাদাকে ক্ষতবিক্ষত করার মধ্যে তুমি কোনো নৈতিক বিচ্যুতি অনুভব করো না। আমার বাহ্যিক অবয়ব তোমার কাছে সংশোধনযোগ্য ত্রুটি, অথচ তোমার দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা তোমার আত্মসমালোচনার পরিধির বাইরেই থেকে যায়। কী নির্মম পরিহাস—যে মানুষ অন্যের বর্ণকে কেন্দ্র করে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করে, সে-ই নিজের মানবিকতার দেউলিয়াপনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার!

তুমি কি জানো, অন্ধকারেরও এক নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব আছে? নিশীথের কৃষ্ণমা ব্যতীত নক্ষত্রের দীপ্তি এত সুস্পষ্ট হয়ে উঠত কি? নিশীথের কৃষ্ণমাকে নির্বাসিত করে প্রভাতের শুভ্রতাকে একাকী সিংহাসনে বসালে, আলোর ঔজ্জ্বল্যও একসময় হয়ে উঠবে একঘেয়ে দ্যুতির নির্জন কারাগার। চন্দ্রের কলঙ্কও যেন সেই মহাজাগতিক সাক্ষ্য—কৃষ্ণিমার সামান্যতম পরশ ব্যতীত শুভ্রতার পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতিও কতখানি অসম্পূর্ণ! অতএব, আমাকে মুছে দিয়ে নিজেকে মহিমাম্বিত করার যে বাসনা, তা সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা নয়, বরং সৌন্দর্যের বহুত্বকে অস্বীকার করার এক আত্মঘাতী ঔদ্ধত্য। প্রকৃতি যেখানে বর্ণের বহুত্বকে অনায়াসে ধারণ করে, সেখানে মানুষ কেন একটি বর্ণকে অন্যটির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়? কেন জন্মগত একটি বৈশিষ্ট্য মানুষের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণের অলিখিত বিধানে পরিণত হয়?

প্রকৃতি কাউকে শ্রেষ্ঠত্বের শংসাপত্র দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করে না। মানুষ জন্মগ্রহণ করে

তার অনিবার্য শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে; কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কে সম্মানিত হবে, কে অবজ্ঞার পাত্র হবে, কে সৌন্দর্যের স্বীকৃতি পাবে আর কে হীনম্মন্যতার ভারে নত হবে—তার অধিকাংশই নির্ধারিত হয় সমাজের নির্মিত ধারণা ও ক্ষমতার কাঠামোয়। অতএব, বর্ণের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবি, তা প্রকৃতির বিধান নয়; বরং মানুষেরই নির্মিত এক কৃত্রিম আধিপত্য, যা যুগে যুগে সৌন্দর্যের সংজ্ঞার আড়ালে নিজের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে।

তাই আজ আমি আমার কৃষ্ণমাকে অস্বীকার করব না। তোমাদের স্বীকৃতির বিনিময়ে নিজের পরিচয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না। তোমাদের নন্দনবোধের অনুকূলে নিজেকে পুনর্গঠনের কোনো বাধ্যবাধকতা আমি স্বীকার করি না। আমার অস্তিত্ব তোমাদের অনুমোদনের অপেক্ষায় অসম্পূর্ণ নয়; আমার আত্মমর্যাদা তোমাদের প্রশংসার ওপর নির্ভরশীল নয়। তোমাদের চোখে সুন্দর প্রতিপন্ন হওয়া বা তোমাদের প্রত্যাশা পূরণ করাই আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য নয়। আমার জীবনের তাৎপর্য নিহিত আমার কর্মে, আমার চিন্তায়, আমার নৈতিক অবস্থানে, আমার মানবিকতার ব্যাপ্তিতে—তোমাদের আরোপিত সৌন্দর্যের সংজ্ঞায় নয়।

যে দৃষ্টি আমাকে কেবল গাত্রবর্ণে পরিমাপ করে, সেই দৃষ্টির স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যানের মধ্যেও আত্মমর্যাদার অধিকার নিহিত রয়েছে।

কারণ, সৌন্দর্য কোনো একক বর্ণের একচ্ছত্র সম্পত্তি নয়; মর্যাদা কোনো বিশেষ অবয়বের উত্তরাধিকার নয়; আর মনুষ্যত্ব এমন কোনো অলংকার নয়, যা বাহ্যিক সাজসজ্জায় ধারণ করা যায়। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার ত্বকের উপরিতলে নয়, তার অস্তিত্বের নৈতিক গভীরতায়।

আমি কৃষিমা—আমাকে আঁধার বলে অভিহিত করার আগে তোমার দৃষ্টির অন্ধকারটুকু চিনে

নাও। আমার বর্ণকে কলঙ্ক বলার আগে তোমার বিবেকের দাগগুলো পরখ করে দেখো। কারণ, আমার ত্বকে যে অন্ধকারের প্রতিচ্ছবি তুমি আবিষ্কার করেছ, তার চেয়েও গভীর অন্ধকার তোমার অন্তঃকরণেই বাস করে।

শিক্ষার্থী, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আপনার লেখা পাঠান — ওয়েবসাইটের “লিখুন” ফর্মে অথবা ইমেইলে:

editor.sahityabatayan@hotmail.com



অনলাইন সংস্করণ | ১৬ অক্টোবর ২০২৬ খ্রি. | ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ | বার: শুক্রবার

✉ editor.sahityabatayan@hotmail.com

f facebook.com/share/1JSyDFrYBK

🌐 digital-bd.github.io/sahiya-batayan

ক্ষমতার মুখোশ

রাইয়্যান ইসলাম রকিব



দীর্ঘ আট বছর পর গ্রামের পথে পা রাখল রাইয়্যান। শহরের ধুলোমুক্ত, পরিশীলিত জীবনে অভ্যস্ত হলেও গ্রামের গন্ধে একধরনের অদ্ভুত টান ছিল তার। তবে আজকের ফেরা আনন্দের নয় অনেকটা দায়িত্ববোধ আর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব থেকে। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জুবারের তার ডান হাতটা কপালে রেখে বলল, "এই জায়গাটাই তো আমাদের শৈশবের সবকিছু ছিল, মনে আছে রাইয়্যান?" রাইয়্যান মৃদু হাসল। চোখ তার সামনে বিস্তৃত কাঁচা রাস্তার দিকে। "হ্যাঁ, অথচ এখন মনে হচ্ছে এই মাটির নিচেই লুকিয়ে আছে অজস্র গোপন সত্য।" জুবারের শহরে পড়াশোনার পাশাপাশি সাংবাদিকতা করত। তার কাছে বিভিন্ন সময় গোপনে খবর এসেছে করিম মিয়ার অপরাধের— মানুষ গুম, জমি দখল, নির্বাচন কারচুপি এমনকি বিরোধী গোষ্ঠীর ওপর রাতের আঁধারে হামলা। তবে রাইয়্যান, করিম মিয়ার নিজের রক্ত। করিম মিয়া তার জন্মদাতা পিতা। সে এখনো তার বাবাকে মনভরে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সত্য কি কখনও রক্তের কাছে হেরে যায়? তারা দু'জন হাঁটতে শুরু করল গ্রামমুখী রাস্তা ধরে। অল্প সময়েই চোখে পড়ল পাড়ার ছেলেগুলোর ভীতসন্ত্রস্ত চেহারা, বাজারের ঝুঁকে পড়া দোকানদার আর মোড়ে মোড়ে বসে থাকা অদৃশ্য পাহারাদারদের চোখ।

এক বৃদ্ধ দোকানদার পিছে ডেকে বলল, "বাবারে, সাবধানে চলো। এখন আর আগের মতো গ্রাম নাই। করিম মিয়ার মানুষ

চৌদ্দ চোখে তাকায়।" জুবারের পাশে দাঁড়িয়ে রাইয়্যানের কানে বলল, "এখানে কিছু একটা আছে রাইয়্যান, খুব গোপন, খুব অন্ধকার। তুই প্রস্তুত তো?" রাইয়্যান চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। তার ভেতর যেন এক অদৃশ্য যুদ্ধে জ্বলে উঠেছে দ্বিধা আর দায়বোধের আগুন। আমি জানি না আমি কী খুঁজতে এসেছি জুবারের, ধীরে বলল রাইয়্যান। কিন্তু এটুকু বুঝি, যদি বাবা সত্যিই সেই মানুষ হন তবে এ ক্ষমতার মুখোশ আমি নিজেই খুলে ফেলব। পেছনে পড়তে থাকা সূর্যটা পশ্চিমাকাশে মিলিয়ে যাচ্ছিল। দু'জন তরুণ এগিয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে, অজানা এক ঝড়ের দিকে। রাইয়্যান এখনো নিরব কিন্তু তার চোখে স্পষ্ট উদ্বেগ। জুবারের তাকে সময় দিচ্ছে— সে জানে, বিশ্বাস হারানো সহজ নয় আর যখন সেই বিশ্বাস গড়েছে রক্তের বন্ধনে, তখন তো আরও কঠিন। তাদের দ্বিতীয় দিন গ্রামেই কাটছিলো। রাইয়্যান বাবার বাসাতেই উঠেছে দোতলায়, রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। চারপাশে সশস্ত্র দেহরক্ষী, প্রতিদিন হাজিরা দেয় এলাকার পাতি নেতা থেকে ইউপি সদস্যরা। করিম মিয়া এখনো চেয়ারে বসেন, যেন মুকুটহীন সম্রাট। জুবারের অবশ্য উঠেছে গ্রামের এক ভগ্নপ্রায় পাঠাগারে। লোকচক্ষুর আড়ালে যার অবস্থান কিন্তু সেখানে তথ্যের খনি। এই পাঠাগার ছিল তার বাবার তৈরি যিনি নিজেও এক সময় শিক্ষক ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর পাঠাগার হয়ে পড়েছে যত্নহীনতায় পরিত্যক্ত। জুবারের পাঠাগারে বসে এক এক করে খুলতে থাকে নথি, পুরনো পত্রিকার কাটিং, জায়গার রেকর্ড।

রাইয়্যান একদিন এসে বসে ওর পাশে এবং জিজ্ঞেস করে— "তুই সত্যি বিশ্বাস করিস বাবা মানুষ খুন করতে পারে?" জুবারের তাকে তাকিয়ে দেখে না। ফাইলের ভেতর থেকে বের করে একটা কালো-সাদা ছবি, দেয় রাইয়্যানের হাতে। এটা আবু তালেব মাস্টারের। খুন হন পাঁচ বছর আগে, তোর বাবার খাস জায়গার উপর বাড়ি করেছিল বলে। মামলা হয়নি, লাশটা পর্যন্ত

পাওয়া যায়নি। "রাইয়্যান চমকে ওঠে। তার মনে পড়ে, ছোটবেলায় তালেব মাস্টার তাকে ইংরেজি শেখাতেন। "কিন্তু বাবার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে না কেন?" জুবারের এবার তাকে দেয় স্থানীয় এক মহিলার নাম যিনি রাশিদা খাতুন। তার স্বামীকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে সন্তাসীরা। রাশিদা এখনো বেঁচে থাকলেও মুখ খোলেন না ভয়, লজ্জা আর উপকারের দায়ে। রাইয়্যান সিদ্ধান্ত নেয়, সে একবার রাশিদার সঙ্গে দেখা করবে।

রাশিদার কুড়ে ঘর। বিকেল নাগাদ রাইয়্যান একা চলে আসে গ্রামে রাশিদার ঘরের দিকে। ছোট টিনের চালা, বাইরে শুকনো গাছের আগুনে রান্না হচ্ছে। রাশিদা তাকে দেখে হতবাক। "আপনে করিম সাহেবের ছেলে না?" রাইয়্যান বসে পড়ে একটা মাদুরে। অনেকক্ষণ চুপচাপ! তারপর বলে, "চাচি, চাচাকে কি আমার বাবা খুন করেছেন?" রাশিদা কাঁপতে কাঁপতে বলল— "আল্লাহে ছুইয়ে বলি, আমি কিছু জানি না। তারা আমার স্বামীকে মাইরা ফালাইছে কিন্তু কেউ কিছু করতে পারে না। আপনি গেলে আপনি খতম হইবেন বাবারে, ও বাবারে!" যেন এক শোকের বাড়ির কান্না। রাইয়্যান বুঝে যায়, ভয় এই সমাজের সবচেয়ে বড় শাসক। সেদিন রাতে বাড়ির পুরনো আলমারি ঘাঁটতে গিয়ে রাইয়্যান খুঁজে পায় একটি ডায়েরি। লেখা, বাবা করিম মিয়ার নিজের হাতের। প্রথম দিকটা সাদামাটা। কিন্তু মাঝামাঝি গিয়ে লেখা— "প্রতিপক্ষ হারাতে হয় শিকড় থেকে। একবার ভয় দেখালে মানুষ কথা বলে না কিন্তু বারবার বললে প্রতিবাদ করে। তাই, চিরতরে নিঃশেষ করাই উত্তম।" রাইয়্যানের হাত কাঁপে। সে বুঝতে পারে, বাবার মুখোশের নিচে আছে এক অন্ধকার অধ্যায়। সে ফিরে যায় জুবারের কাছে। বলে— "তুই যা বলছিলি, সব সত্য। আমরা যা ভাবছি তা ছোট কিছু না।" জুবারের চোখ তুলে চায় এরপর মুচকি হেসে বলে, "তাহলে শুরু করি?"

আপনার লেখা পাঠান — ওয়েবসাইটের “লিখুন” ফর্মে অথবা ইমেইলে:

editor.sahityabatayan@hotmail.com



ক্ষমতার মুখোশ

রাত গভীর। ঘুমোচ্ছে পুরো গ্রাম। কিন্তু জেগে আছে দুটি চেতনা রায়হান ও জুবায়ের। তারা প্রতিরোধ শুরু করতে প্রস্তুত। রাত পেরিয়ে সকাল এল এক অদ্ভুত নিরবতায়। তবে, এই নিরবতা ছিল তীব্র সিদ্ধান্তের পূর্বভাস। রায়হান ও জুবায়ের আজ প্রথমবারের মতো এক নতুন অধ্যায়ের শুরু করতে যাচ্ছে। একটি সুশৃঙ্খল প্রতিরোধ। তারা সিদ্ধান্ত নেয় ক্ষমতার মুখোশ খুলবে তথ্য দিয়ে, আন্দোলন দিয়ে, এবং সর্বোপরি জনগণের ভয় ভাঙিয়ে। পুরনো পাঠাগারই তাদের ঘাঁটি। জুবায়েরের পুরনো বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন এখন কলেজ শিক্ষক, কয়েকজন ছাত্রনেতা আবার কেউবা কৃষক। সবাইকে একত্র করে তারা গঠন করে একটি স্বচ্ছসেবী সামাজিক প্ল্যাটফর্ম যার নাম "ন্যায়ের মিছিল"। তাদের শপথ একটাই— "কোনো নেতা নয়, কোনো দল নয় আমরা মানুষের পক্ষে দাঁড়াবো। সত্যের পক্ষে।" তারা ভাগ হয়ে যায় কে কোথায় গেলে কী তথ্য পাবে, কোন মামলা গুলো চাপা পড়ে গেছে, কোন পরিবার বিচার পায়নি সবকিছু লিপিবদ্ধ করতে থাকে। গ্রামের দেয়ালে দেয়ালে লাল অক্ষরে তারা লিখে, "ভয় নয়, প্রতিবাদ করো চোখে বাঁধন পড়েছে, মুখে নয়! চেয়ার নয়, মানুষই শেষ কথা"।

তারা পোস্টার ছাপায়, হ্যান্ডবিল তৈরি করে। ফেসবুকে তৈরি করে একটি গোপন পেজ যেখানে তারা ভিডিও ও তথ্য পোস্ট করতে শুরু করে। দুই দিনেই করিম মিয়া টের পেয়ে যান বাতাসে পরিবর্তনের গন্ধ। তিনি ডেকে পাঠান রায়হানকে। "তুই আমার ছেলে।। আমার রক্ত। আমার পিঠে ছুরি মারছিস?" রায়হান শান্ত গলায় বলে, "আপনি যা করেছেন, করছেন তা ছুরি নয়? আপনি কি সত্যিই নিজের ছেলেকে বিশ্বাস করেন নাকি কেবল নিজের ক্ষমতাকে?" করিম মিয়ার চোখে তখন অন্যরকম আগুন। তিনি বুঝে যান ছেলের মন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সপ্তাহ শেষে

রায়হানরা আয়োজন করে প্রথম মিছিল তবে রাজনৈতিক ব্যানার ছাড়া। শুধু সাধারণ মানুষ, চাষা, ছাত্র, গৃহবধু। স্লোগান—

"আমরা মানুষ, ভোট আমাদের অধিকার, হত্যার বিচার চাই, শাসকের নয়!" গ্রামের বাজারে গিয়ে তারা দাঁড়ায়।

সামনে রায়হান। পাশে জুবায়ের। পেছনে শতাধিক কণ্ঠ। তাদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় করিম মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনী। কিছুক্ষণের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। কিন্তু কেউ কাউকে আঘাত করে না পুলিশ আসে, করিম মিয়ার পোষা পুলিশ। রায়হানকে দেখে তারা চুপ থাকে।

জুবায়ের এগিয়ে গিয়ে বলে, "আমরা কোনো দাঙ্গা করতে আসিনি। শুধু জানতে চাই, এই এলাকার প্রতিটি খুনের মামলা কেন নিষ্পত্তি হয় না?" কেউ উত্তর দেয় না। কিন্তু বাজারের মানুষ থমকে দাঁড়ায়। কেউ একজন মোবাইলে ভিডিও করতে থাকে। এটাই ছিল তাদের প্রথম জয়। রাতে পাঠাগারে এক অচেনা চেহারা। রুবি, রায়হানের চাচাতো বোন। সে বলল, "তোমরা যা করছো তা বিপদ ডেকে আনছে। কিন্তু আমি আছি। আমি, শিক্ষকদের সংগঠনে কথা বলবো।" রুবি ছিল স্কুলশিক্ষিকা। লেখাপড়ায় তুখোড়। তার যোগদানে 'ন্যায়ের মিছিল' হয়ে ওঠে আরও সংগঠিত আরও মানবিক। রাত বাড়ে। পাঠাগারে রায়হান দাঁড়িয়ে জানালায় তাকিয়ে থাকে। দূরে বাবা করিম মিয়ার বিশাল বাড়ি। আমার বাবা একটা পদ্ধতির অংশ, জুবায়ের। শুধু তাকে সরালেই কিছু হবে না। গোটা সিস্টেমটাকে ভাঙতে হবে। "জুবায়ের মাথা নাড়ে। "তাহলে শুরু হোক আসল লড়াই।" গ্রাম এখন আর আগের মতো নেই। প্রতিটি বাড়িতে, প্রতিটি চায়ের দোকানে কেবল একটাই আলোচনা, "রায়হান কি তার বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে? সত্যিই কি করিম মিয়া এত খারাপ?" কিন্তু আলোচনা বেশিদিন স্থির থাকল না। শাসকের ক্ষমতা যখন প্রশ্নবিদ্ধ হয় তখন সে

প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নিষ্ঠুরভাবে, নির্মমভাবে। এক রাতে 'ন্যায়ের মিছিল' এর দুই সদস্য তানভীর ও লিপি ঘরে ফেরার সময় নিখোঁজ হয়ে যায়। পরদিন সকালে পাশের খালে পাওয়া যায় তানভীরের গায়ের রক্তমাখা শার্ট। লিপির খোঁজ নেই। পুরো গ্রাম স্তব্ধ। কেউ মুখ খুলছে না। রায়হান থানায় যায় জিডি করতে। ওসি হেসে বলেন, "তুই বাবার মতো হতে পারলি না রায়হান ভাই। ওনার মতো লোক হলে থানায় আসার দরকার হইত না। রায়হান বুঝে যায়, খেলা শুরু হয়ে গেছে। পরের দিন করিম মিয়ার পক্ষ থেকে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে কয়েকটি পোস্টার ও লিফলেট, "বাবার মুখে ছুরি মারা সন্তানদের মানুষ ক্ষমা করে না" "দেশবিরোধী চক্রান্তকারীরা গ্রামে অস্থিরতা তৈরি করছে" "ন্যায়ের মিছিল = দেশের দুশমন" এবার রায়হানের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে ঘৃণা ছড়ানো শুরু হয়। পাড়ার কয়েকজন আত্মীয় পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু তাতেও দমে না রায়হান-জুবায়ের। বরং আরও শক্ত হয়। এক গভীর রাতে পাঠাগারে ঢুকে পড়ে মুখোশধারী কয়েকজন সাথে লাঠি, রড, আগুন। তারা ভাঙচুর চালায়। রুবির হাতে আঘাত লাগে। কিছু বই পুড়িয়ে দেয়। 'ন্যায়ের মিছিল' এর ডায়েরিগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়। কিন্তু জুবায়ের আগেই গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য পেনড্রাইভে সংরক্ষণ করে রেখেছিল। পুলিশ আসে না। স্থানীয় চেয়ারম্যান (যিনি করিম মিয়ার দলেই ছিলেন) হাসতে হাসতে বলেন, "নতুন ছেলে, নয়া নাটক শুরু করছিল। পুড়ে গেলে বোঝে আগুন কেমন জিনিস।" পরের দিন রায়হান নীরব ছিল। সবার সামনে এসে শুধু বলল, "তারা আমাদের কণ্ঠ বন্ধ করতে চায় না, তারা চায় আমাদের মুখে ফেলতে।" জুবায়ের ধীরে ধীরে বলে, "তাহলে এবার সময় এসেছে প্রশাসনের উত্থবর্তন মহলে যাওয়ার।"

তারা ঢাকায় এক মানবাধিকার সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে।

আপনার লেখা পাঠান — ওয়েবসাইটের “লিখুন” ফর্মে অথবা ইমেইলে:

editor.sahityabatayan@hotmail.com



অনলাইন সংস্করণ | ১৬ অক্টোবর ২০২৬ খ্রি. | ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ | বার: শুক্রবার

✉ editor.sahityabatayan@hotmail.com f facebook.com/share/1JSyDFrYBK 🌐 digital-bd.github.io/sahiya-batayan

ক্ষমতার মুখোশ

তারা ঢাকায় এক মানবাধিকার সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে। পত্রপত্রিকায় তুলে ধরে করিম মিয়ার অপরাধের দলিলসহ প্রমাণ। দেশজুড়ে শুরু হয় আলোচনা। তানভীরের লাশ অবশেষে খুঁজে পাওয়া যায়। তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। সেই খবর মিডিয়ায় আসার পর সামাজিক ক্ষোভ তৈরি হয়।

এক রাতে রায়হানের মা তাকে ডেকে বলেন, "তুই যা করতেছিস, তাতে হয়ত আমাদের শেষ হবে। কিন্তু আমি তোর পাশে আছি। অনেকদিন। অনেকদিন চুপ ছিলাম আর না।" এটাই ছিল রায়হানের জেগে ওঠার আরেক নিয়ামক শক্তি। এক রাতে করিম মিয়া নিজের ঘরে বসে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "ছেলেটাকে সরিয়ে ফেলো। যত দ্রুত সম্ভব।" কিন্তু সে জানে না, ইতিহাস কখনও রক্ত দিয়ে লিখলেও রক্তই একদিন রাজত্ব ভেঙে দেয়।

রায়হান আর জুবায়ের এবার আর প্রতিরোধ নয়, প্রত্যাঘাত এর জন্য প্রস্তুত। ঘড়ির কাঁটার মতো এগিয়ে চলছিল প্রতিরোধ। প্রতিদিন নতুন নতুন খবর, নতুন মুখ, নতুন প্রতিবাদ। রায়হান আর জুবায়েরের প্রতিবাদ এখন আর শুধুমাত্র গ্রামের বিষয় নয়, এটা জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে। রুবি ও জুবায়ের ঢাকায় গিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাকে দেয় হত্যা মামলার আলামত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভিডিও সাক্ষ্য। খাসজমি দখলের নথিপত্র। স্কুলের অর্থ আত্মসাৎ ও ভুয়া বিল-ভাউচারের কপি। পুলিশ ও চেয়ারম্যান অফিসের ঘুষের প্রমাণ। একটি ভিডিও ভাইরাল হয় যেখানে করিম মিয়ার এক গুন্ডা স্বীকার করেছে, "হ, আমরাই মিছিল ভাঙছি, চেয়ারম্যানের নির্দেশে। আর না করলে তো আমরাই মরতাম।"

এই ভিডিও টিভিতে প্রচার হয়। করিম মিয়া চারপাশ থেকে ফেসে গিয়েছেন, অন্যায় যেন

তাকে ঘিরে ফেলেছে। এবার রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকরাও মুখ ফিরিয়ে নেন। স্থানীয় এমপিও ফোন ধরেন না। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হয়। তিনি কেবল দুঃখ করে বললেন, "ক্ষমতা থাকলে সবাই পাশে থাকে। এখন আমার পাশে আর কেউ নেই।" তার পিএ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে পুলিশের গাড়ির শব্দ। বিশাল পুলিশ ফোর্স করিম মিয়ার বাড়ি ঘিরে ফেলে। বাড়ির ভেতর থেকে বের হন করিম মিয়া, হাতকড়া পরা। গ্রামের মানুষ চেয়ে থাকে নিঃশব্দে। অনেক চড়াই-উৎরাই এরপর গ্রেফতার হলেন করিম মিয়া। রায়হান সামনে দাঁড়িয়ে, চোখে জল গড়িয়ে পরছে। কিন্তু ঠোঁটে কঠিন স্বর, "আপনি আমার বাবা হলেও, একটা সিস্টেম ছিলেন।

আজ শুধু আপনি নন, সেই সিস্টেমের মুখোশটাও খুলে গেছে।" করিম মিয়ার বিরুদ্ধে খুন, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নয়টি মামলা হয়। একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। মিডিয়া প্রতিদিন প্রচার করে নতুন নতুন তথ্য। পাঁচ মাসের মধ্যে আদালতে বিচার শুরু হয়! জর্জ সাহেব করিম মিয়ার পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। নির্বাচনের সময় আসে। গ্রামের মানুষ এবার ভিন্ন রায় দেয়। তারা কোনো রাজনৈতিক প্রার্থীকে ভোট দিতে চাইনা। প্রস্তাব আসে, "রায়হান বা জুবায়েরকে চেয়ারম্যান করা হোক।" রায়হান অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, "আমি নেতা হতে আসিনি। আমি। আমি সিস্টেম বদলাতে এসেছিলাম। যেখানে আমি সাফল্য অর্জন করেছি।" তবে জনগণের চাপে জুবায়ের প্রার্থী হয়। জুবায়ের সাফ সাফ জানিয়ে দেন—

"আমার একটাই কথা; প্রতিজ্ঞা করছি পদের লোভে নয় সত্যের পাশে থাকব।" নির্বাচনী ফলাফলের দিন জুবায়ের বিপুল ভোটে জয়ী হয়। এক সকালে পাঠাগারে বসে রায়হান একখানা চিরকুট লেখে— "আমার বাবা ছিলেন শাসক। আমি হতে চাই সেবক। মুখোশের রাজনীতি আর

নয় এবার চেনা মুখ চাই, বিশ্বাস চাই। পাশ থেকে রুবি রায়হানকে জিজ্ঞেস করেন— রায়হান ভাই এবার "তাহলে কি সব শেষ?" রায়হান হাসে, "না, এটা তো কেবল শুরু। ক্ষমতারতার মুখোশ শুধু একটিই নয়, হাজারো মুখোশ লেগে আছে আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, মানসিকতায় এখনো। সবাই যখন সমাজ গঠন করতে ব্যস্ত, স্বৈরাতন্ত্র নির্মূল করতে কঠোর— তখন করিম মিয়া দুই বছরের মাথায় কোন এক ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে গেলেন। যার খোঁজ এখনো অজানা।

আপনার লেখা পাঠান — ওয়েবসাইটের “লিখুন” ফর্মে অথবা ইমেইলে:

editor.sahityabatayan@hotmail.com